রূপক ও সাংকেতিক নাটক : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যকে শিল্পরূপের ভিত্তিতে নানা পর্যায় বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ গদ্য, পদ্য, সংগীত ও নৃত্য। এই চারটি মাধ্যমের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যকে গদ্যনাট্য, কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য এই চারটি ভাগে সনাক্ত করা চলে। যেমন, বলা চলে 'শেষরক্ষা' গদ্যনাট্য; 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' কাব্যনাট্য, 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য, 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য। আবার নাট্যলক্ষণ অনুযায়ী অন্য এক ধরনের বিভাজনও চলে। যেমন, বলা যায়—'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' ও 'মালিনী' রোমান্টিক ট্র্যাজিডি, প্রথম দুটি শেক্সপীয়রীয় আদলে, তৃতীয়টি গ্রীক নাট্যকলার আদলে গড়া, অনুরূপভাবে 'গোড়ায় গলদ' 'শেষরক্ষা' রোমান্টিক কমেডি, 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ব্ল্যাক কমেডি, এবং 'হাস্যকৌতুক' বা 'অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি' প্রভৃতি কৌতুকনাট্য। এগুলি ছাড়া নাট্যলক্ষণ বিচারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গোত্রের একটি নাট্যগুচ্ছ হ'ল 'শারদোৎসব, 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি। এই গুচ্ছটির নাম দেওয়া হয়েছে রূপক, সাঙ্কেতিক নাট্যগুচ্ছ। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় হ'ল নাট্যগুচ্ছের মধ্যে বিশুদ্ধ রূপক বা বিশুদ্ধ সঙ্কেত পৃথক করা দুরূহ, আসলে তাঁর এই নাটকগুলির মধ্যে সর্বদা ও সর্বত্র রূপক ও সঙ্কেতের মিলন ও মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। বড়োজোর এইটুকু বলা যায় যে, 'ডাকঘর' সঙ্কেতমুখ্য নাটক এবং 'মুক্তধারা' রূপকমুখ্য নাটক।

'মুখ্য' এই অভিধাটি সংযুক্ত হওয়ায় এই সত্যই আভাসিত হচ্ছে যে ডাকঘরে রূপকের উপকরণ যেমন আছে তেমনি 'মুক্তধারাতেও সংকেত একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। তাই 'রাজা' নাটককে সাঙ্কেতিক না বলে বলা উচিত সংকেতমুখ্য। ঠিক তেমনি রূপক নয়—'রক্তকরবী' হ'ল রূপকমুখ্য নাটক।

আলোচনার সুবিধার জন্যই এবার রূপক ও সঙ্কেত-এর সংজ্ঞা নিরূপণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। রূপক হ'ল alligory. আর সংকেত হ'ল symbol. অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায় রূপক হ'ল বাচ্য থেকে বাচ্যান্তরে গমন, সঙ্কেত হ'ল বাচ্য থেকে বাচ্যাতিরিক্ত অর্থান্তরে গমন। কথাটি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

রূপক নাটকে বহিরঙ্গে থাকে একটি সম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর অর্থ। আর ঠিক এর সমান্তরালভাবে অন্তরঙ্গে থাকে দ্বিতীয় একটি সম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর অর্থ। অর্থাৎ বাইরে একটি বাচ্য ভিতরে আর একটি বাচ্য। প্রথম বাচ্যটির দ্বারা দ্বিতীয় বাচ্যটি আচ্ছাদিত হয়ে আছে।

রূপকের অর্থ সেই বুঝতে পারবে যে প্রথমটির দ্বারা দ্বিতীয়টিতে গিয়ে উপনীত হতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'অচলায়তন' নাটকের ঐ চতুর্দিক রুদ্ধ আয়তন (institution)-টি আভাসিত করছে সংস্কারজালে বদ্ধ ধর্মীয় কুসংস্কার। প্রথমটি বাচ্য, দ্বিতীয়টি বাচ্যান্তর। বাচ্য থেকে বাচ্যান্তরে অর্থের উন্মোচনে এটি রূপক হয়ে উঠেছে।

Scanned with CamScanner

অনুরূপভাবে বলা যায় 'ডাকঘর' নাটকে শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত নামধারী রাজার এক একজন ডাকহরকরা আসলে এক একটি ঋতুর রূপক। আবার বিভূতির হাতে গড়া 'মুক্তধারা' নাটকের যন্ত্রবাঁধটি আসলে এশিয়ার প্রাণধারাকে রুদ্ধ করে দেওয়া ইউরোপের ধনতন্ত্রশাসিত আধুনিক বিজ্ঞানের রূপক।

রূপকের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ (Particular) থেকে আর একটি বিশেষে পৌঁছেই তাৎপর্য শেষ হয়ে যায়। এই দুটি বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ অর্থ, আগেই বলা হয়েছে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল।

কিন্তু সংকেত-এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অন্যরকম। সেখানে একটি বাচ্য থেকে অন্য বাচ্যে নয়, বরং একটি বাচ্য নিজেকে ছাড়িয়ে অসীম ব্যাঞ্জনায় নব নব অর্থান্তরে কেবলই সম্প্রসারিত হয়ে চলে। এইসব সূক্ষ্ম 'Nuance' (Alternative Possible meanings) ঐ বাচ্যটি থেকে কখনই সুস্পষ্টভাবে পৃথক করা চলে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা বলতে পারি যে 'রক্তকরবী' এই ফুলটিকে যখন নন্দিনী নিজের দেহে আভরণ করে গড়ে তখন সেই ফুলের লালিমা হয়ে ওঠে রঞ্জনের প্রেমের সঙ্কেত, আবার সেই একই ফুল যখন হয়ে ওঠে 'প্রলয়পথের দীপশিখা' তখন সেই লালিমা হয়ে ওঠে বিপ্লবের আলো। এই লাল রঙ কখনও মোড়লের চোখে ভয়ের সঙ্কেত আনে, আবার নাটকের শেষাংশে পশ্চিমের রক্তসন্ধ্যার সঙ্গে মিলে এই লাল এক নবসৃজনবাহী ভাঙনের আগুন এঁকে দেয়।

অনুরূপ ভাবে আমরা বলতে পারি যে 'ডাকঘর' নাটকে 'রাজার চিঠি একদিকে যেমন মুক্তির খবর বহন করে আনে তেমনি অন্যদিকে এই চিঠি যখন ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে তারার আলোর হরফে সমস্ত নীল আকাশ জুড়ে লেখা হয় তখন প্রেমের বার্তা আর মৃত্যুর বার্তা পরস্পরের মধ্যে একাকার হয়ে একটি রহস্যসঙ্কেত রচনা করে। রবীন্দ্রনাথের রূপকমুখ্য নাটকগুলিতেও এই সংঙ্কেতের উপাদান আছে বলেই তা শুধু বক্তব্যের বাহকরূপে নয়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপেও রসিকসমাজে আস্বাদ্যমান হয়েছে। কারণ যে 'ধ্বনি' (Suggestion) বা ব্যঞ্জনাকে বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ কাব্যের আত্মা, সেই ব্যঞ্জনা সঙ্কেতের মধ্যেই লভ্য। রূপকে নয়। এই জন্যই রূপক কাব্য সাধারণত শ্রেষ্ঠকাব্যের পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাটকে রূপক সঙ্কেত মিশ্রিত হয়েছে বলেই তার রূপকমুখ্য নাটকও একেবারে ব্যঞ্জনাশূন্য নয়।

এই পর্যায়ের নাট্যগুচ্ছের একটি কালানুক্রমিক তালিকা করা যেতে পারে : শারদোৎসব (১৯০৮), রাজা (১৯১০), ডাকঘর (১৯১২), অচলায়তন (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), গুরু (১৯১৮), অরূপরতন (১৯২০), ঋণশোধ (১৯২১), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬), দেখা যাচ্ছে ১৯০৮ থেকে ১৯২৬—এই দেড় যুগের মধ্যেই নাটকগুলি রচিত হয়েছে এর মধ্যে গুরু, অরূপরতন ও ঋণশোধ যথাক্রমে 'অচলায়তন', 'রাজা' ও 'শারদোৎসব'-এর অভিনয়োপযোগী রূপান্তর। কাজেই এই তিনটি বাদ দিলে এই পর্যায়ের মোট নাট্যসংখ্যা দাঁড়ায় সাতটি। এর মধ্যে শারদোৎসব, রাজা, ডাকঘর,—তিনটি সঙ্কেতমুখ্য নাটক। 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' রূপকমুখ্য নাটক।

Scanned with CamScanner

'শারদোৎসব' নাটকটি মূলত শান্তিনিকেতনের শিশু ও বালকদের অভিনয়ের প্রয়োজনেই রচিত হয়েছিল। পূজার ছুটির পূর্বে বিদ্যালয়ের বালকেরা শরৎ ঋতুর বন্দনা করে একটি পালা অভিনয় করবে এমন তাগিদ হয়তো রবীন্দ্রনাথের মনে ছিলো। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তীকালে রচিত 'শ্রাবণগাথা', 'বসন্ত' বা 'নবীন' প্রমুখ ঋতুনাট্যগুলির কথাও হয়তো মনে পড়বে। 'শারদোৎসব' মূলতঃ শরৎ ঋতুর অভ্যর্থনা এবিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এহো বাহ্য। আসলে এই নাটকের অন্যতম সঙ্কেতিত অর্থ হ'ল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটি আনন্দময় দেওয়া নেওয়া যুগযুগান্তর ধরে চলছে। এই চলাটি যেন দ্যোতিত হয় আকাশ আর ধরিত্রীর দেওয়া নেওয়ার মধ্য দিয়ে। বর্ষার আকাশ ধরিত্রীকে ঢেলে দিয়েছিলো জলধারা। সেই ঋণ নিয়ে ধরিত্রী হয়ে উঠলো উর্বর। শরতে পাকাধানের যে পীত হরিদ্রাভা ছড়িয়ে গেল আকাশের বুকে। সে যেন বর্ষার ঋণ শরতে শোধ হওয়া। এই সীমা আর অসীমের নিত্য সম্পৃক্ত লেনাদেনাই যেন মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে এক হাসিকান্নার লীলাময় সম্পর্ক পাতিয়েছে। ছেলেরা সবাই মিলে উপানন্দর সঙ্গে ঋণশোধের খেলা শুরু করেছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ঠাকুর্দা আর রাজা। প্রকরণের দিক দিয়েও 'শারদোৎসব' একটি অভিনবত্ব সূচিত করলো। ভেঙে গেল পাশ্চাত্ত্য তিনদিকবদ্ধ রঙ্গ মঞ্চের কৃত্রিমতা, দর্শক ও অভিনেতৃবর্গের দূরত্ব, স্থান কালের প্রথাগত ধারাবাহিকতা, সমস্ত নাটকটি বাঁধা হ'ল খোলা পথের উপর। যেন এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটককে সংযুক্ত করলেন আমাদের দেশজ নাটগীতি পালাগানের ঐতিহ্যের সঙ্গে। স্বভাবতঃই সংলাপ আর সংগীত প্রায় সমপ্রাধান্য পেল। সংগীতের মধ্যে যে 'অর্থভারহীন' সুরের নিত্যস্পন্দমানতা তা যেন ভাষাকে বিশেষ শব্দার্থের বন্ধন ছাড়িয়ে নিয়ে গেল সংকেতের মহাকাশে। এইসব প্রকরণগত লক্ষণগুলি শুধু শারদোৎসবে নয়, এর পরবর্ত্তী সমস্ত নাটকগুলিতে বারবার দেখা দিয়েছে।

'রাজা' নাটকে অনেকে অধ্যাত্মতত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। বলেছেন, এটি জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনতত্ত্ব। অবশ্য এটিকে অন্য এক দিক দিয়ে বলা যেতে পারে self বা 'ছোট আমি' ও soul বা 'বড়ো আমি'র দ্বন্দ্ব ও সম্মিলনের নাটক। অন্যদিক দিয়ে আবার এটির মধ্যে নরনারীর প্রেমের একটি সত্যও আবিষ্কার করা চলে। চোখের ভালোলাগা আর মনের ভালোবাসা যে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার সুদর্শনার ভ্রান্তি ও ভ্রান্তিমোচনের মধ্য দিয়ে যেন সেই সত্যই নাট্যরূপায়িত হয়েছে।

'ডাকঘর' আসলে রবীন্দ্রমানসের আসক্তিমুক্তির যে নিত্যনিয়ত দ্বন্দ্ব তারই রূপায়ন। অমলের মধ্যে যেন ভৃত্যরাজকতন্ত্রে বন্দী শিশু রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাওয়া যায়। কবিরাজ এবং পিসেমশাই ভেবেছিলেন বাইরে যেতে দিলেই অমলের অসুখ বেড়ে যাবে। কিন্তু আসলে বহির্ভুবন থেকে অমলের এই বিচ্ছিন্নতাই তার অসুখের হেতু। তাই তার দুয়ারের সম্মুখ দিয়ে যে বিচিত্র মানুষের মিছিল-অসীম মুক্তির খবর যেন তারা দিয়ে যায় অমলের কানে। একসময় রাত্রি হয়। অমল ঘুমিয়ে পড়ে। দ্বার ভেঙে যায়। রাজার আগমনের খবর আসে। এই রাজা যদি বিরাটের সৌন্দর্যরূপ হয়, তবে মাটির ফুল কুড়িয়ে বেড়ানো

Scanned with CamScanner

যে সুধার কাজ সে এই মাটির পৃথিবীর সৌন্দর্যরূপ। অমলকে সেও ভোলে নি।

'অচলায়তন'-এ মূলতঃ রূপকের উপকরণই বেশী। আর সেই জন্য স্বভাবতঃই এর মধ্যে একটি স্পষ্ট বক্তব্য ধরতে পারা যায়। সেযুগের গোঁড়া হিন্দুরা এই নাটকটির প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন এই কারণে যে রবীন্দ্রনাথ এখানে হিন্দু আচারধর্মের প্রতি ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন। আসলে বিশেষ কোন ধর্ম নয়, যেকোন ধর্মেই আচার যখন মননের স্পর্শবঞ্চিত হয় তখন তা অর্থহীন অভ্যাসের আবৃত্তিতে মানুষের স্বাধীনচিত্তবৃত্তিকে বন্দী করে। 'পঞ্চক' সেই বন্দীত্বের বিরুদ্ধে মুক্তির বার্তাবহ। পঞ্চকের প্রকৃতির প্রতি দুর্বাধ্য আকর্ষণ, দর্ভক ও শোণপাংশুদের সখ্যলীলা ও আকাশে সমাগত আষাঢ়ের কালোমেঘ এই রূপকনাট্যটির চারিপাশে সঙ্কেতের আভা রচনা করে।

'ফাল্গুনী'ও 'শারদোৎসব'-এর মতোই একদিক দিয়ে ঋতুনাট্যের পর্যায়ে পড়ে। বসন্তের জয়গাথাই এর আলম্বন। কিন্তু নিসর্গবিশ্বের বসন্তই মানববিশ্বের যৌবন। এই যৌবন বৃদ্ধরূপী জরাসন্ধের দুর্গ ভেঙে ফেলে নবজীবনের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দেয়। 'স্থবিরের শাসন নাশন' এই বিদ্রোহী যৌবনের জয়গান আসলে সবুজপত্র যুগের রবীন্দ্রমানসকেই অভ্রান্তরূপে চিহ্নিত করে।

'মুক্তধারা'—মূলতঃ পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানমদমত্ততার প্রতিবাদ। কিন্তু ঘনায়মান অন্ধকারে অম্বার সুমনের প্রতি আহ্বান, আকাশচুম্বী যন্ত্রসেতুটির অজস্র চিত্রকল্পের স্ফুলিঙ্গবর্ষণ, ধনঞ্জয়ের সংগীত আর মৃত্যুপথযাত্রী অভিজিতের উদ্দেশে সঞ্জয়ের অর্থগর্ভ মরমী সংলাপ একটি অনতিব্যক্ত সাঙ্কেতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে।

'রক্তকরবী'—যেখানে ধনতন্ত্রের শোষণ ব্যাপারের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের নাটক সেখানে তার মধ্যে রূপকের অর্থই প্রধান। কিন্তু রাজা যেখানে নিজের মধ্যেই একাধারে রাবণ ও বিভীষণকে বহন করে কিংবা রঞ্জনের মৃত্যুর পর রাজাই যেখানে হয়ে ওঠেন রঞ্জনের বিকল্প সত্তা কিংবা যেখানে আমরা দেখি কয়েক লক্ষ বছর বেঁচে থাকা ফাটলের ব্যাঙটিকে, সর্বোপরি বিশুপাগোলের গানগুলিতে যে চির অপ্রাপণীয়ার উদ্দেশ্যে প্রচ্ছন্ন একটি আবেগ তা অশ্রুধারার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে বিচিত্র বর্ণাভায় বিচ্ছুরিত হতে থাকে-সেখানেই বোঝা যায় স্পষ্ট রূপকার্থ অতিক্রম করে রক্তকরবীও এক থেকে অনেক অর্থে রসিকচিত্তে এক নিত্যস্পন্দিত সংক্রাম রচনায় সাংকেতিকতার গুণ পেয়ে যায়।

আমাদের আলোচিত এই রূপকসাংকেতিক রবীন্দ্রনাটকগুলি বহুদিন নাট্যাকারে কাব্য বলে অবজ্ঞেয় ছিল। আসলে প্রথাগত বাংলা থিয়েটারের ঐতিহ্য থেকে এই নাটকগুলি এতো স্বতন্ত্র যে এর নাট্যগুণ প্রাচীনযুগের অভিনেতা বা অভিনয় পরিচালকগণ অনুধাবন করতেই পারেন নি। অথচ অভিনয় যোগ্যতাই নাটকের সাফল্যলাভের শেষ কথা। এই নাটকগুলির মধ্যে যে অসামান্য অভিনয়যোগ্যতা রয়ে গেছে তা রবীন্দ্রতিরোধানের পর প্রমানিত হয়েছে। আর তার জন্য এই নাট্যগুচ্ছের সঙ্গেই বহুরূপীর নাম ঐতিহাসিকভাবে সংপৃক্ত হয়ে আছে।

Scanned with CamScanner